॥ ৩৪ ॥

শব্দার্থতত্ত্ব ও অর্থপরিবর্তনের ধারা
(Semantics and Change of Meaning)

ভাষার দু'টি দিক হচ্ছে ঃ তার বাইরের প্রকাশরূপ (expression aspect) এবং তার ভিতরের ভাব বা অর্থ (content aspect)। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার এই অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics বলে। কোনো-কোনো বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার শুধু বাইরের গঠনের (Structure) উপরে জোর দেন এবং শব্দার্থকে ভাষাবিজ্ঞানের বহির্ভূত বলে উপেক্ষা করেন। তাঁদের মতে শব্দের অর্থ বা ভাব মানুষের মানসিক প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে, এবং যেহেতু মানুষের মনের খেলাকে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা যায় না, সেহেতু শব্দার্থতত্ত্বকে ঠিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই তাঁরা শব্দার্থতত্ত্বকে (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে আনতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আব্রাহাম্ নোয়াম্ চম্স্কি

(Abraham Noam Chomsky) যে নতুন রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative) ভাষাবিজ্ঞান প্রবর্তন করেছেন, তাতে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদের সমর্থক ভাষাবিজ্ঞানীরা অর্থকে ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠনের (deep structure) সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন, অর্থের সঙ্গে যোগ রেখেই ভাষার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন। আমাদের মনে হয় শব্দার্থই হল ভাষার প্রাণ; এই ভাব বা অর্থকে বাদ দিলে ভাষার কোনো উপযোগিতাই থাকে না। তাই ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি তার ভিতরের অর্থেরও পরিবর্তন হয়। ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের যেমন নানা কারণ আছে তেমনি অর্থপরিবর্তনেরও নানা কারণ আছে। এই কারণগুলিকে প্রথমত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) স্থূল কারণ, (২) সূক্ষ্ম কারণ। স্থূল কারণগুলিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি :—(ক) ভৌগোলিক, (খ) ঐতিহাসিক এবং (গ) উপকরণগত। সূক্ষ্ম কারণগুলিকে আবার নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(ক) সাদৃশ্য (খ) মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, (গ) শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা, (ঘ) আলঙ্কারিক প্রয়োগ ইত্যাদি।

অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণ :

ভৌগোলিক কারণ : একই শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে প্রায়ই ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন—মূল শব্দ 'অভিমান' বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল কোমল প্রকৃতিতে যে অর্থ বহন করে তাতে কোমল অনুভূতি 'স্নেহ-মিশ্রিত অনুযোগে'র ভাব আছে। কিন্তু পশ্চিম ভারতের শুষ্ক কঠিন কঠোর প্রকৃতিতে 'অভিমান' শব্দের অর্থে সেই কোমলতা নেই, হিন্দীতে সেখানে 'অভিমান' মানে 'অহংকার' 'অহংভাব'। বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুতে আমিষ আহার অপেক্ষাকৃত অনুকূল বলে ভোজ্য তালিকায় তা অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার পরিবেশে নিরামিষ খাবার খাওয়া খুব স্বাস্থ্যসম্মত নয় বলে তার স্থান সঙ্কুচিত। এখানে তাই 'শাক' শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ—শুধুই ভোজ্যপত্র বোঝায়। কিন্তু পশ্চিম ভারতের জলবায়ুতে নিরামিষ আহারই প্রশস্ত হওয়ায় ভোজ্য তালিকায় তার স্থান ব্যাপক এবং সেখানে 'শাক' শব্দ ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্ত—সেখানে যে-কোনো নিরামিষ তরকারিই 'শাক'।

ঐতিহাসিক কারণ : জীবনধারার পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থও পরিবর্তিত হয়। 'আর্য' শব্দটি এসেছে √ঋ (অর্) থেকে; √'ঋ'='গমন করা'। √ঋ+ন্যৎ=আর্য=গমনধর্মী। ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যদের জীবনধারা কৃষিনির্ভর হয়ে উঠেনি। অরণ্যের পশুপ্রাণী ফলমূল খেয়ে জীবন নির্বাহিত করত বলে এরা বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াত। তাই 'আর্য' নামের মূল অর্থ 'গতিশীলতা'>'গতিশীল গোষ্ঠী'। পরে কৃষিনির্ভর স্থিতিশীল জীবনযাত্রা গড়ে ওঠার পরেও তাদের 'আর্য' নামটি থেকেই যায়। তখন 'গতিশীল জনগোষ্ঠী' থেকে অর্থ-পরিবর্তিত হয়ে অর্থ দাঁড়ায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের নৃজাতি।

আদিম কালে পুরুষেরা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হরণ করে ঘোড়ার পীঠে বহন করে নিয়ে যেত। 'বিবাহ' কথাটি এই বিশেষ রূপে বহন করার অর্থেই প্রথমে প্রচলিত হয়। ক্রমে সমাজে এই আদিম বর্বর বিবাহ-বিধি অপ্রচলিত হয়ে যায়। অধুনিক সমাজে যেখানে বহন করার প্রশ্ন নেই, এমন কি যেখানে পাত্রই ঘরজামাই হয়ে থাকতে পারে, সেখানেও বিবাহ কথাটি প্রযুক্ত হয়; এখন বিবাহ মানে বিশেষ রূপে বহন করা নয়, এখন বিবাহ মানে 'পরিণয়-সূত্র'।

উপকরণগত : যে উপকরণে কোনো বস্তু তৈরী হয় সেই উপকরণের নাম বা ধর্ম অনুসারে অনেক সময় বস্তুটির নামকরণ হয়, কিন্তু পরে সেই উপকরণটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও পুরোনো নামটিই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে পুরোনো নামটির সঙ্গে উপকরণটির যোগ থাকে না, পুরোনো নামে নতুন জিনিসকে বোঝায়, অর্থাৎ সেখানে নামটির অর্থ এমন পরিবর্তিত হয়ে যায় যে তাতে নতুন উপকরণে গঠিত বস্তুকে বোঝায়। যেমন—আগে 'কালি' (ink) বলতে 'কালো' (black) উপকরণে গঠিত কালো তরল পদার্থকেই বোঝাতো। পরে 'লাল', 'সবুজ' প্রভৃতি রঙের উপকরণে গঠিত পদার্থকেও বোঝাতে থাকে; 'কালি' বলতে শুধু কালো তরল পদার্থকে বোঝায় না, 'লাল', 'সবুজ' প্রভৃতি রঙের তরল পদার্থকেও বোঝায়। প্যাপিরাস্ (Papyrus) গাছের মজ্জা দিয়ে কাগজ তৈরী হত বলে ইংরেজীতে কাগজকে বলা হত 'পেপার' (Paper)। এখন সেই উপকরণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, প্যাপিরাস্ গাছ ছাড়াও বাঁশের মণ্ডে তৈরী কাগজকেও পেপারই (Paper) বলা হয়।

অর্থপরিবর্তনের সূক্ষ্ম কারণ :

সাদৃশ্য : সাদৃশ্যের প্রভাবে শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটতে পারে। এই সাদৃশ্য আবার দু'দিক থেকে হতে পারে—একটি শব্দের ধ্বনির সঙ্গে অন্য শব্দের ধ্বনির সাদৃশ্য এবং একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সাদৃশ্য। 'রোদসী' শব্দের

সংগে 'ক্রন্দসী' শব্দের যে আংশিক ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে তারই ফলে 'ক্রন্দসী' শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বৈদিক ভাষায় 'ক্রন্দসী' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদ্বয়'[২৪]; আর বৈদিক ভাষায় 'রোদসী' শব্দের মূল অর্থ 'দুই জগৎ' (স্বর্গ ও পৃথিবী)[২৫], তা থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'অন্তরীক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ 'রোদসী' শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্য ধরে 'ক্রন্দসী' শব্দটিও 'অন্তরীক্ষ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। একটি জিনিসের সংগে অন্য একটি জিনিসের আকৃতি বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অনেক সময় একটি জিনিসের নাম অন্য জিনিসটি বোঝবার জন্যেও প্রযুক্ত হয়। যেমন—যে শস্য থেকে তিল-তেল তৈরী হয় সেই শস্যের কালো রঙের সঙ্গে মানুষের গায়ের চামড়ায় ছোট্ট গোল কালো রঙের দাগের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, তাই ওই দাগটিকেও 'তিল' বলা হয়। এর ফলে তিল কথাটির মূল অর্থের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে। 'তিল' শব্দে শুধু বিশেষ শস্যকেই বোঝাতো, এখন গায়ের বিশেষ কালো দাগকেও বোঝায়।

মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার : সাধারণ লোকের ধারণা—অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এই সংস্কারের বশে অনেক সময় অশুভ বিষয়কে বা বিপজ্জনক বস্তুকে শুভ বা শোভন নাম দেওয়া হয়, একে সুভাষণ (euphemism) বলে। এতে নতুন নামটির নতুন অর্থে প্রয়োগ হতে-হতে তার অর্থবিস্তার ঘটে বা অর্থপরিবর্তন ঘটে। যেমন—'মৃত্যু' অর্থে 'গঙ্গা লাভ করা', 'সাপ' অর্থে 'লতা', সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে মৃত্যু অর্থে 'দেহরক্ষা করা' বা 'মহাসমাধি লাভ করা', 'আর সন্তান দিও না'—এই অর্থে 'আর না কালী' থেকে 'আন্নাকালী'। এই রকম নিম্নশ্রেণীর লোককে 'হরিজন' বলা, বাড়ির ঝিকে 'কাজের লোক' বলা হয়।

শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা : ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের (laxity) বশে অনেক সময় একটা শব্দগুচ্ছের সবটা ব্যবহার না করে তার অংশবিশেষ দিয়ে আমরা কাজ চালাই। এতে শব্দটির নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। যেমন—'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' এই অর্থে 'সন্ধ্যা দেওয়া', ; 'একটু চা-টা খেয়ে যাও' এবং 'চায়ের সঙ্গে টা না দিলে আমি শুধু চা খাব না'—এখানে 'টা' মানে 'জলখাবার'।

২৪। ঋগ্বেদ-সংহিতা ২।১২।৮
২৫। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১।১৬০।৪

আলঙ্কারিক প্রয়োগ : আলঙ্কারিক অর্থে কোনো শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকলে অনেক সময় শেষে শব্দটি আলঙ্কারিক তাৎপর্য হারিয়ে সাধারণ গতানুগতিক অর্থেই প্রচলিত হয়ে যায়, বা শব্দের কিঞ্চিত অর্থপরিবর্তন ঘটে। যেমন—সন্ধ্যায় ফোটে বলে একটি ফুলকে সন্ধ্যার মণিস্বরূপ কল্পনা করে প্রথমে তাকে আলঙ্কারিক অর্থে 'সন্ধ্যামণি' বলা হয়েছিল। এখন বহু-ব্যবহারের ফলে এটি একটি ফুলের সাধারণ নাম হয়ে গেছে। ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়া অর্থে 'গণেশ ওল্টানো', মিথ্যা কথা বলা অর্থে 'গুলমারা' ইত্যাদি।

অর্থপরিবর্তনের ধারা

প্রধানত তিনটি ধারায় অর্থপরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন :—

(১) অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার (Expansion of Meaniag)
(২) অর্থসংকোচ (Reduction or Contraction of Meaning)
(৩) অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ (Alteration or Transfer of Meaning)

(১) অর্থবিস্তার :—যদি কোনো শব্দ প্রথমে কোনো সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে ব্যাপক ভাব বা অধিকতর বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে 'অর্থবিস্তার' বা 'অর্থপ্রসার' বলা হয়। সাধারণত রূপক বা অতিশয়োক্তির জন্যে এরকম অর্থবিস্তার ঘটে থাকে। যেমন আগে সংস্কৃতে 'বর্ষ' শব্দের অর্থ ছিল 'বর্ষাকাল', অর্থাৎ বৎসরের একটিমাত্র অংশ। পরে শব্দটি বৎসরের একটিমাত্র অংশ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে সারা বৎসর অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে। এখানে 'বর্ষ' শব্দের অর্থবিস্তার ঘটেছে। তেমনি সংস্কৃতে 'পরশ্বঃ' শব্দের অর্থ আগে ছিল 'আগামী কালের পরের দিন' (ভবিষ্যৎকাল)। এই শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে 'পরশু'। কিন্তু এর মানে এখন হয়েছে 'আগামী কালের পরের দিন' ও 'গতকালের আগের দিন' অর্থাৎ যা শুধু ভবিষ্যৎকালের অর্থ বোঝাতো তা এখন ভবিষ্যৎ ও অতীত দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এখানে 'পরশু' শব্দের অর্থবিস্তার ঘটেছে। 'কালি' শব্দের মূল অর্থ 'কালো রঙের তরল পদার্থ' এখন কালি বলতে যে কোনো রঙের লেখার কালিই বোঝায়। 'মীরজাফর' মূলত এক ব্যক্তির নাম, এখন যে-কোনো বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি অর্থেই আমরা ব্যবহার করি।

(২) অর্থসংকোচ : প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একাধিক বস্তু বা

ব্যাপক ভাবকে না বুঝিয়ে তার মধ্যে একটিমাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থসঙ্কোচ বলে। যেমন সংস্কৃতে প্রথমে 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ ছিল 'সব রকমের আলো'। পরে বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় সব রকমের আলো নয়, একটি বিশেষ রকমের আলো যা পিতল বা মাটির তৈরী এবং যা তেল ও সল্‌তে সংযোগে আলো দান করে। এখানে প্রদীপ শব্দের অর্থসঙ্কোচ হয়েছে। 'মনুষ্য' থেকে বাংলায় আগত 'মুনিস' শব্দের অর্থ সর্বশ্রেণীর মানুষ নয়, শুধুই 'মজুর'।

(৩) **অর্থসংক্রম :** শব্দের অর্থপরিবর্তন কতকগুলি ধাপের মধ্যে দিয়ে হয়। অনেক সময় অর্থপরিবর্তন হতে-হতে শেষ ধাপে এসে শব্দের এমন নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায় যে মূল অর্থের সঙ্গে তার যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন মনে হয় শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে অন্য বস্তুতে সরে এসেছে; এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রম। যেমন, সংস্কৃতে প্রথমে 'ঘর্ম' বলতে বোঝাতো 'গরম'। এখন বাংলায় বোঝায় 'ঘাম' বা 'স্বেদ'। আরো সার্থক উদাহরণ হল 'পাত্র' শব্দের অর্থ। সংস্কৃতে এর অর্থ ছিল 'পান করার আধার'। তা-ই থেকে অর্থবিস্তারের ফলে মানে দাঁড়ায় 'যে-কোনো রকমের আধার', তা-ই থেকে অর্থসংকোচের ফলে মানে দাঁড়ায় 'কন্যা দান করার আধার', এখন সংকীর্ণ অর্থ হল 'বর'। এখানে যেহেতু মূল অর্থের সঙ্গে বর্তমান অর্থের যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেহেতু একে অর্থসংক্রম বলতে পারি। 'সন্দেশ' শব্দেও অর্থপরিবর্তনের একাধিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে। এই শব্দের মূল অর্থ ছিল 'খবর, সংবাদ'। যখন ডাকব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না তখন আত্মীয়ের বাড়ীতে যে ব্যক্তি খবরাখবর নিতে যেত সে কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে যেত। এই অনুষঙ্গের সূত্র ধরে সন্দেশ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় মিষ্টান্ন। 'খবর' থেকে 'মিষ্টান্ন'—এটা অর্থসংক্রম। প্রথমে যে কোনো রকমের মিষ্টান্ন বোঝাত। এখন এক বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন বোঝায়। এটা আবার অর্থসঙ্কোচ। সাম্প্রতিক কালে 'চামচে' শব্দের অর্থ 'ছোট্ট হাতা' থেকে 'তোষামদকারী', 'অতি অনুগত ব্যক্তি' হয়েছে, এটাও অর্থসংক্রম।

অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি : উপরে উল্লিখিত ধারাগুলি ছাড়া শব্দার্থ-পরিবর্তনের আরো দু'টি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন কেউ-কেউ। সে দু'টি হল—অর্থোন্নতি (Elevation or Melioration of Meaning) এবং অর্থাবনতি (Degeneration or Pejoration of Meaning)। কোনো শব্দের অর্থ যদি এমন ভাবে পরিবর্তিত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে

বোঝাতো তার চেয়ে সম্মানিত বা আদৃত ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তা হলে তাকে অর্থোন্নতি বলে। যেমন—'বাতুল' শব্দের মূল অর্থ 'বায়ুগ্রস্ত, উন্মাদ, পাগল' (বাত+উল)। কিন্তু 'বাতুল' থেকে আগত 'বাউল' শব্দের অর্থ 'বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়'। তেমনি 'ভোগ' শব্দের মূল অর্থ উপভোগ বা খাদ্যসামগ্রী। কিন্তু দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হলে 'ভোগ' শব্দের অর্থোন্নতি ঘটে। আবার কোনো শব্দের অর্থপরিবর্তনের ফলে যদি এমন হয় যে, শব্দটিতে পূর্বাপেক্ষা হেয় বা তুচ্ছ বিষয়কে বোঝাচ্ছে তাহলে তাকে বলে অর্থাবনতি। যেমন—'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি ; কিন্তু মহাজন শব্দে যখন মহাজনী-কারবারীকে অর্থাৎ ঋণ-ব্যবসায়ীকে বোঝায় তখন শব্দের অর্থাবনতি হয়েছে বোঝা যায়। তেমনি মনুষ্য>মুনিষ (labourer), শ্যালক>শালা, উপাধ্যায়>ওঝা>রোজা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও অর্থাবনতি ঘটেছে। এরকম অর্থোন্নতি ও অর্থাবনতি নামে স্বতন্ত্র ধারার উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু দৃষ্টান্তগুলি সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায় এগুলি পূর্বোক্ত কোনো-না-কোনো ধারায় পড়ে, অধিকাংশই আংশিক বা পূর্ণ অর্থসংক্রম মাত্র।

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারায় অতীত ইতিহাসের ইঙ্গিত :

শব্দের অর্থপরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে জাতির সামাজিক ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন 'কলম' শব্দের মূল অর্থ হল 'শর' বা 'খাগ'। এ থেকে বোঝা যায় আগেকার দিনে লোকে শরের কলম ব্যবহার করত। ইংরেজী 'পেন' (pen) শব্দটি লাতিন penna থেকে এসেছে। লাতিন ভাষায় শব্দটির অর্থ ছিল 'পাখির পালক'। এ থেকে অনুমান করা যায় পাশ্চাত্য দেশে আগেকার দিনে লোকে পাখির পালকের কলম ব্যবহার করত। 'আর্য'

শব্দের অর্থ সন্ধান করলে জানতে পারি ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যদের জীবনযাত্রা ছিল গতিশীল যাযাবর (√ঋ+ণ্যৎ=আর্য। √ঋ=গমন করা ; আর্য=গমনধর্মী, গতিশীল)। 'বিবাহ' শব্দের মূল অর্থ 'বিশেষ রূপে বহন করা'। এ থেকে কোনো-কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন অতীতে বিবাহ-যোগ্যা কন্যাকে অপহরণ করে ঘোড়ার পীঠে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। 'বিবাহ' শব্দের মূল অর্থের মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে। শব্দের অর্থপরিবর্তনের ধারা থেকে এইভাবে সমাজের অতীত ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।